তাঁকে পড়তে হয় নিজের সঙ্গে এবং লেখকের সঙ্গে তর্ক করে

শিবনারায়ণ রায়, কবির নির্বাসন ও স্রোতের বিরুদ্ধে

শংকরলাল ভট্টাচার্য

শিবনারায়ণ রায়ের দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ অবশেষে একটাই বই হয়ে হাতে এল— কবির নির্বাসন ও স্রোতের বিরুদ্ধে। এর ভূমিকায় লেখক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের রাসেল স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের এক সন্ধের অ্যানেকডোট বলেছেন। সেখানে সেদিন সুধীন্দ্রনাথ ও স্ত্রী রাজেশ্বরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও এক মার্কিন বন্ধু চ্যাডবোর্ন গিলপ্যাট্রিক। কথায় কথায় গিলপ্যাট্রিক জিজ্ঞেস করেছিনেল শিবনারায়ণকে, আপনি সাহিত্যের, না কি সমাজের ক্রিটিক। লেখক উত্তর দেবার আগেই সুধীন্দ্রনাথ ও আইয়ুব যুগপৎ ঘোষণা করেছিলেন তখন, শিবনারায়ণ সাহিত্য এবং সমাজ দুইয়েরই ক্রিটিক। শুধু ক্রিটিক নন, দু'পক্ষেত্রেই তিনি একজন সৃজনশীল চিন্তক (ক্রিয়েটিভ থিঙ্কার)। সেদিনের সেই প্রশংসা পাবার বাস্তব যোগ্যতা তাঁর ছিল কি না সেই বিচারের ভার অতঃপর শিবনারায়ণ তাঁর পাঠকদের তুলে দিয়েছিলেন বর্তমান বইটির মাধ্যমে।

বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেই বিচারের ভার খুব গুরুদায়িত্ব নয়। কারণ প্রবন্ধে-প্রবন্ধে, অনেক প্রবন্ধের প্যারায় প্যারায়, অনেকানেক বাক্যের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে এবং ষোলোটি প্রবন্ধ মাধ্যমে মেলে ধরা তাঁর জগদ্দর্শনে শিবনারায়ণ এমনই মুগ্ধতা ও সমীহ রচনা করেন যে উপর্যুক্ত প্রশংসার জন্য সুধীন্দ্রনাথ বা আইয়ুব কাউকেই খুব মাথা ঘামাতে হয়নি। শিবনারায়ণের ভূমিকা ও গুরুত্ব বুঝতে আজকের কোনও পাঠকেরই মাথা ঘামাতে হয় না; মাথা ঘামানোর কাজটা তাঁদের লেখককে যুক্তির সঙ্গে অনুসরণ করায়।

বর্তমান বই দুটি অংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে পূর্বে কয়েকবার পড়েছি; সেই পাঠকের অভিজ্ঞতার একটা দিক নতুন করে ফিরে এল বিগত কয়েক দিনেও। তা হল, শিবনারায়ণকে পড়তে হয় ক্রমাগত নিজের সঙ্গে এবং লেখকের সঙ্গে তর্ক করে করে। যখন লেখক আমার নিজের মধ্যকার কোনও সংশয় বা দৌর্বল্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে ধরেন তখন তর্ক নিজের সঙ্গে; যখন তিনি নিজের কোনো দৌর্বল্য, নির্মমতা বা আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করে বসেন তখন তর্ক লেগে যায় তাঁর সঙ্গে। কিন্তু এই উভয় ক্ষেত্রেই পাঠক হিসেবে যা আমি পাই, তা এক কথায় সুপিরিয়র এন্টারটেনমেন্ট। উচ্চস্তর বিনোদন। যা কবিতার মতো আনন্দবর্ধনের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কিছুটা কিছু বিমর্ষ ও সজাগ করে।

বর্তমান বইটি শুরু হয়েছে এমন দুটি প্রবন্ধ দিয়ে যা বলতে গেলে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের নীতি, যুক্তি ও ধর্ম সংক্রান্ত। প্রথম প্রবন্ধটি 'লেখক ও পাঠক', দ্বিতীয়টি 'কবির নির্বাসন'। দ্বিতীয় প্রবন্ধের বিষয় প্লেটো ও তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিকুলের বিতাড়ন। প্লেটোর মতো কবিপ্রাণ দার্শনিক কেন শেষ পর্যন্ত দর্শনের কষ্টিপাথর সাহিত্যকে বিচার করে কবিকে রিপাবলিক থেকে ভাগালেন, সে-তত্ত্ব কেন প্লেটোভক্তরাও যথেষ্ট বুঝতে পারেননি, তাতে অবাক হয়েছেন শিবনারায়ণ। প্লেটোর বিরুদ্ধে যুক্তি গড়ার আগে তিনি শর্তসাপেক্ষে প্লেটোকে স্বীকারই করে নিয়েছেন। লিখেছেন, 'চারিত্র, সত্য ও প্রেরণা বলতে প্লেটো যা বুঝেছেন তা যদি আমরা মেনে নিই, তবে সাহিত্য বিষয়ে প্লেটোর অভিযোগ খণ্ডন করা শুধু কঠিন নয়, বোধহয় অসম্ভব হয়ে পড়ে।"

তবে না, শিবনারায়ণ বাঙালি সমাজে প্লেটোকে পরিচিত করানোর জন্য এই বহুচর্চিত বিষয়টি নিয়ে কোনও কলেজি নোট লেখেননি; তিনি সাহিত্য ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে একটা আধুনিক বিচারে আসতে চেয়েছেন। সেই বিচার ও তন্নিহিত বিশ্লেষণ কিন্তু আমার মতো আরো অনেক পাঠককে উচ্চকিত ও বিভ্রান্ত করবে। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থাকে বিভিন্ন স্থানে যে সব সার্বিক জীবনদর্শন এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তাদের সঙ্গে প্লেটোনিক চিন্তার আত্মীয়তা স্পষ্ট। এবং অন্য কোনও যুক্তি-প্রমাণ যদি না-ও দেখানো হয়, শুধু এই সব রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে প্লেটোনিক জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে কি শিল্পসাহিত্য, কি মানুষের মুক্তিসাধনা উভয়ের ভবিষ্যৎই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন।"

প্লেটোর 'প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা ও প্রভাবের' বিচার শিবনারায়ণ আহরণ করেছেন কার্ল পপারের দ্য ওপন সোসাইটি অ্যান্ড ইটস এনিমিজ, লাঙ্গ-এ দ্যা হিস্ট্রি অব মেটিরিয়ালিজম্ এবং রাসেলের আ হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলোজফি থেকে। এই তিনজনই অতিশয় বিচক্ষণ এবং প্রগাঢ় পণ্ডিত, কিন্তু প্লেটোর মতো এঁদেরও আমরা তর্ক করে করে পড়ি, গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করি, এবং সর্বতো সমর্থন না করেও শ্রদ্ধা করি। এক অর্থে এঁরা যৌথভাবে শিবনারায়ণের মানসিক গঠন ও মনস্তত্ত্বের আর্কিটাইপ। সম্ভবত এই তিনজন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তা ও রচনার থেকে শিবনারায়ণ দর্শনের ভিত্তিতে সমাজ ও সাহিত্য বিচারের নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করে নিয়েছেন।

যে ঘোর সিনিসিজ্‌ম্ দিয়ে 'কবির নির্বাসন' রচনাটি শেষ হয়, সেই সংশয় কিন্তু 'লেখক ও পাঠক' রচনার সিদ্ধান্তপর্বে নেই। সেখানে সৎ পাঠক সৃষ্টির দায়িত্ব লেখক একা সাহিত্যিকের ওপর রাখেননি, অনেকখানি দায়িত্ব বন্টন করেছেন, শিক্ষক, সমালোচক এবং সমাজসংস্কারকদের মধ্যেও। বলতে গেলে সাহিত্যসমাদরের এ এক সামাজিক, দার্শনিক বিস্তার। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাহিত্যসমাদরকে এই রকমই এক ব্যাপক প্রক্রিয়ায় উন্নত

করার চেষ্টা হয়েছিল বলেই মনে হয় (দ্রষ্টব্য জর্জ টমসনের দ্য হিউম্যান এসেন্স, রেমন্ড উইলিয়ামসের রাইটিং অ্যান্ড সোসাইটি ও জ্যোতি ভট্টাচার্যের পরিপ্রশ্ন), তবে তার স্তালিনীর ভাবান্তর ও রূপান্তর এক অন্য প্রসঙ্গ।

সংকলনের এক অপূর্ব সুন্দর রচনা 'রেনেসাঁস ও মানবতন্ত্র'। একটি মাত্র প্রবন্ধের আয়তনে রেনেসাঁস বিষয়ে এত পর্যন্ত আলোচনা বাংলায় আর পড়েছি বলে মনে হয় না। রেনেসাঁস শিবনারায়ণের আরও অনেক রচনার আবহ কিংবা মূল সুর রচনায় সাহায্য করেছে। বর্তমান গ্রন্থের পাঠক মন দিয়ে সদ্যোক্ত রচনাটি পাঠ করলে বৌদ্ধিক ও হার্দিকভাবে উপলব্ধি করবেন তাঁর 'বাংলার রেনেসাঁস' প্রবন্ধের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। এ রকম একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

''বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বৌদ্ধিক-সাহিত্যিক কৃতি বিশেষ সম্মানার্হ, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ত্রুটি ছিল বই কি। বিস্মৃত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পুনরাবিস্কার, মূল্যায়ন ও প্রয়োজন অনুসারে স্বীকরণ করতে গিয়ে বঙ্গীয় ভাবুকরা সেই উত্তরাধিকারের কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিকের প্রতি সাধারণভাবে অনাগ্রহী থেকে যান। বিভিন্ন উপনিষদ ও ধর্মশাস্ত্র এবং পরের দিকে গীতাকে তাঁরা অত্যধিক মূল্য দিয়েছিলেন। কিন্তু বৈশেষিক, চার্বাক ও অন্যান্য জড়বাদী চিন্তাধারার, বৌদ্ধ দর্শন ও নব্যন্যায়, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবদেহ সম্পর্কে অতীত কালের নানাবিধ দিকগুলির চর্চা উনিশ শতকী বাংলায় যুক্তিশীলতার বিকাশে সহায়ক হতে পারত। ভারতীয় উত্তরাধিকারের একটি প্রধান ধারা ইসলামের সূত্রে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত প্রবাহিত। এই ধারাটিতে ধর্ম-বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধ যতই প্রাধান্য পাক, এটি একদা দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিকিৎসাবিদ্যার সম্পদে সমৃদ্ধ ও বলশালী ছিল। কিন্তু শিক্ষা সুযোগহীন অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় ঘটেনি। মুল্লা, মৌলবী এবং আশরফজন এই ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না; এবং যেসব হিন্দু ভাবুক বঙ্গীয় রেনেসাঁসে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁরাও আরব সভ্যতার উত্তরাধিকার বিষয়ে অবহিত হননি।''

'রবীন্দ্রনাথ ও গোয়টে', 'উইলিয়াম ব্লেকের ছবির জগৎ','সত্য, শ্লীলতা এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্য'-র মতো প্রবন্ধাদির পাশাপাশি পড়তে পাওয়া যায় বইটিতে 'নাস্তিকের ধর্মজিজ্ঞাসা'। সুকঠোর যুক্তিনিষ্ঠ এই রচনাটিতে এমন কিছু কিছু জায়গা আছে যা আমার চোখে জল বয়ে এনেছে। যখন লেখক রবীন্দ্রনাথ, র‍্যোদ্যাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ বা মাদার টেরিজার প্রসঙ্গ এনে বলেন, ''(এঁদের) ভিতরেও আমি মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা দেখতে পাই। কোনো ধর্মবিশ্বাস যদি এই নীতিবোধের সহায়ক হয়, তাকে অগ্রাহ্য করা অন্তত আমার বিচারে অসঙ্গত ঠেকে।''

শিবনারায়ণ রায়ের প্রবন্ধ পাঠের শ্রেষ্ঠ ফসল হল স্বয়ং লেখকের প্রতি সমীহ রক্ষা করেও তাঁর দ্বারা বিরক্ত হওয়া। শত্রুতাহীন বিরোধিতা বড়জনকেই করা যায়। আমিও ওঁর কিছু কিছু দ্রুত মন্তব্যে বিচলিত বোধ করেছি। এরকম একটি অবাস্তব মন্তব্য আছে 'রবীন্দ্রনাথ ও গোয়েটে' প্রবন্ধে। লেখক লিখেছেন— 'উনিশ শতকের শেষদিক থেকে এদেশে জিজ্ঞাসা-বিরোধী হিন্দু স্বাদেশিকতার যে আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে (বাংলা দেশে যে আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন প্রথমে বিবেকানন্দ এবং পরে অরবিন্দ) রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পর্যন্ত তার প্রভাব অনেকটাই কাঠিয়ে উঠতে পারেননি।'

হিন্দু স্বাদেশিকতার যুগ হিসেবে যে-সময়টিকে শিবনারায়ণ শনাক্ত করেছেন সে-সময় স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান ভারত লিখছেন; ভারতীয় কূপমমডুকতা ও অন্ধ স্বাদেশিকতাকে এত প্রশ্ন, এত এত প্রশ্ন তৎকালে ও তৎপরবর্তী একশো বছরে আর কোনও লেখক করেছেন বলে জানি না। 'বর্তমান ভারত' -এর 'শূদ্র জাগরণ' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষ' -এর মতন অধ্যায় বিস্মৃত হয়ে বিবেকানন্দকে 'জিজ্ঞাসা - বিরোধী হিন্দু স্বাদেশিতার' নেতা বলা ডিটনের বিজ্ঞানকে জ্যোতিষচর্চা বলে চালানোর শামিল। আর এর ঈষৎ পরবর্তী যুগে অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় বোমা বেঁধে, জেল খেটে, দেশাত্মবোধী পত্রিকা সম্পাদনা করে আর রাষ্ট্রদোহী সম্পাদকীয় লিখে কীরকম জিজ্ঞাসা-বিরোধী স্বাদেশিকতা করেছেন তা শিবনারায়ণ রায়ই ভাল জানবেন। ইতিহাস ও মনীষীদ্বয়ের রচনাবলি থেকে আমি তা আবিষ্কার করতে পারিনি।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮